ফিতনার ইতিহাস

ড. রাগিব সারজানি

ফিতনার ইতিহাস

অনুবাদ
মাহদি হাসান

মাকতাবাতুল হাসান

ফিতনার ইতিহাস

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com - wafilife.com

ISBN : 978-984-96318-5-9

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com

fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৫০০/=

Fitnar Itihash

By Dr. Ragheb Sergani

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক/সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ প্রকাশের অনুমতি নেই।

ফিতনার ইতিহাস

মূল	:	ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ	:	মাহদি হাসান
সম্পাদনাপর্ষদ	:	আতাউস সামাদ, রাশেদ আবদুল্লাহ
ভাষা সম্পাদনা	:	মাহমুদুল্লাহ মুহিব
সূত্র সংযোজন	:	রাশেদ আবদুল্লাহ
বানান সমন্বয়	:	মুনতাসির বিল্লাহ, কাজী আছিফুজ্জামান, সাজ্জাদ শরিফ
পৃষ্ঠাসজ্জা	:	তারিকুল হাসান তানভীর
প্রচ্ছদ	:	উজ্জ্বল আহমেদ
প্রকাশক	:	মো: রাকিবুল হাসান খান

অর্পণ

"যুন নুরাইন তথা দুই নুরের অধিকারী। রাসুল ﷺ-এর দুই কন্যার স্বামী। একাধিকবার রাসুল ﷺ-এর মুখে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মহান সাহাবি এবং ইসলামের তৃতীয় খলিফা **উসমান ইবনে আফফান রা.**। যিনি বিদ্রোহীদের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন..."

বিষয়সূচি

ভূমিকা ১৩
গ্রন্থটি যেসব উদ্দেশ্যে লেখা ১৫
মনগড়া হাদিস রচনাকারীদের শ্রেণিভাগ ২৫
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর নিকট ফিতনাবিষয়ক বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ ৩৪
সাহাবিগণের পরিচয় ৪১
ফিতনাবিষয়ক নির্ভরযোগ্য আরও কিছু গ্রন্থ ৪৩
দুই নূরের অধিকারী উসমান ইবনে আফফান রা. ৪৬
সাহাবিগণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আলেমগণের বক্তব্য ৫১

উসমান ইবনে আফফান রা.-এর পরিচয় ৫৩
উসমান রা.-এর লজ্জাশীলতা ৬০
উসমান রা.-এর ঈমান ৬০
উসমান রা.-এর কুরআন তেলাওয়াত ৬১
দাসদের সঙ্গে উসমান রা.-এর আচরণ ৬২
উসমান রা.-এর নামাজ-রোজা ৬২
উসমান রা.-এর বাগ্মিতা ৬৩
উসমান রা.-এর দয়াশীলতা ৬৪
উসমান রা.-এর প্রজ্ঞা ৬৫
উসমান রা.-এর খেলাফতকালের অবদান ও ঘটনা ৭০
উসমান রা. জানতেন কী ঘটবে তার সঙ্গে ৭৫

ইবনে সাবার আত্মপ্রকাশ ও ফিতনার সূচনা ৭৮
ইবনে সাবার চিন্তাধারা ৭৯
যারা ছিল ইবনে সাবার অনুসারী ৮১
উসমান রা.-এর ওপর আরোপিত যত অপবাদ ৮৭
উসমান রা.-এর ওপর আরোপিত অপবাদসমূহের জবাব ৮৯

বিদ্রোহীরা মদিনায় ১৩৯
বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিল যারা ১৩৯
বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যসমূহ ১৪১
মিথ্যা চিঠি ও বিদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তন ১৪৫
গৃহবন্দি হলেন উসমান রা. ১৪৯
সাহাবিগণের অবস্থান ১৫৩

উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ড ও স্থায়ী ফিতনার সূচনা ১৬৪
উসমান রা.-এর শাহাদাতবরণ ১৬৬
উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের পর সাহাবিগণের অবস্থা ১৭০
উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছে গেল সাহাবিগণের কাছে ১৭১
সংবাদ যখন শামে পৌঁছল ১৭৩
সংবাদ যখন আয়েশা রা.-এর কাছে পৌঁছল ১৭৪
উসমান রা.-এর দাফন ১৭৫

খেলাফতের দায়িত্বে আলি রা. ১৭৭
মুআবিয়া রা.-এর অবস্থান ১৮১
আলি রা.-এর গভর্নর পরিবর্তন ১৮২
শামের উদ্দেশে আলি রা. ১৮৪
গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নোত্তর ১৮৬
কেন এই মতভিন্নতা ১৯১

জঙ্গে জামালের প্রেক্ষাপট ১৯৬
আয়েশা রা. ও তার বাহিনীর বসরায় গমনের সিদ্ধান্ত ১৯৬
আয়েশা রা. ও তার বাহিনীর বসরায় পদার্পণ ১৯৯
কাকা ইবনে আমর রা. ও সন্ধির সুসংবাদ ২০৫

জঙ্গে জামাল ২০৯
হাওয়াব জলাশয়ের পানি ও কুকুরের ডাকের ঘটনা ২১৩
ফিতনাবাজ নেতাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা ২১৫
যুদ্ধের সূচনা ২১৯
জঙ্গে জামালে আয়েশা রা.-এর ভূমিকা ২২৩
আলি রা. ও আয়েশা রা.-এর মধ্যকার সংলাপ ২২৮

সিফফিন যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ২৩২
সিফফিনের উদ্দেশে উভয় পক্ষের যাত্রা ২৩৭
যুদ্ধক্ষেত্রে উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের কাছে সাহায্য চাওয়ার
ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য ২৪৪

রণাঙ্গনের চিত্র ২৪৬
আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর শাহাদাতবরণ ২৫০
আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ও বিদ্রোহী দল ২৫১
কুরআন উত্তোলনের কৌশল ২৫৪

সিফফিনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা ২৫৬
বিদ্রোহী কারা? ২৬৩
ইসলামে বিদ্রোহীদের বিধান ২৬৫
সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-এর বক্তব্য ২৬৯
সালিশ নির্ধারণ ও ফলাফল ২৭১

ধর্মীয় বিষয়ে কোনো ব্যক্তিকে সালিশ নির্ধারণ ২৭৬
কথা সত্য মতলব খারাপ ২৭৭
সালিশ নির্ধারণের অদৃশ্য রহস্য ২৮৭
আবু মিখনাফের বানোয়াট বর্ণনা ২৮৭
দুই সালিশের প্রকৃত ঘটনা ২৯০

আলি রা.-এর হত্যাকাণ্ড ২৯২
খারেজিগোষ্ঠী ও নাহরাওয়ান যুদ্ধ ২৯৩
মিশরের পরিস্থিতি ৩০২
আলি রা.-কে হত্যার ব্যাপারে তিনজনের ষড়যন্ত্র ৩০৭
আলি রা.-এর শাহাদাতবরণ ৩১০
মুআবিয়া রা.-কে হত্যার চেষ্টা ৩১৪
আমর ইবনুল আস রা.-কে হত্যার চেষ্টা ৩১৫
হাসান রা. ও আমুল জামাআ ৩১৫

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করি। ক্ষমাপ্রার্থনা করি তাঁর কাছে এবং তাঁর কাছে চাই সঠিক পথের দিশা। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং মন্দ আমল থেকে। আল্লাহ তাআলা যাকে সরল পথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সুপথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তিনি একক সত্তা, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং রাসুল।

পরকথা, আমরা আজ ইসলামি ইতিহাসের বেদনাসিক্ত একটি অধ্যায় উন্মোচন করতে যাচ্ছি। সময়ের যে প্রান্তে এসে সম্মানিত সাহাবিগণের হাতেই শহিদ হয়েছিলেন অনেক সাহাবি। আমরা কথা বলব ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফিতনা উসমান ইবনে আফফান রা.-এর হত্যাকাণ্ড নিয়ে। আলোচনা করব আলি রা. এবং মুআবিয়া রা.-এর মতো সম্মানিত সাহাবিদ্বয়ের মধ্যকার লড়াই নিয়ে। কথা বলব এক অনভিপ্রেত ঘটনায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সাহাবিগণের শাহাদাত নিয়ে। যা সেসময় ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে রেখেছিল বিরাট নেতিবাচক প্রভাব।

সত্যি বলতে, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ধারণার চেয়েও কঠিন। কারণ, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে কোনো ভুল মন্তব্য করা মানে জান্নাতি একজন ব্যক্তির ব্যাপারে ভুল মন্তব্য করা। সকল সাহাবিকে আমরা জান্নাতি মনে করি। রাসুল ﷺ তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। তাদের মর্যাদার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআনের অনেক আয়াত। তাই তাদের কোনো একজনের ব্যাপারে ভুল মন্তব্য করা অবশ্যই মারাত্মক এবং ভয়াবহ ব্যাপার।

তবে অচিরেই আমরা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব, যেগুলোর আলোকে আমরা এই ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব।

আর যেকোনো উৎস থেকে এ ফিতনা নিয়ে অধ্যয়ন করা ঠিক হবে না। কারণ, অনির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এ বিষয়টি অধ্যয়ন করা খুবই বিপজ্জনক। এর কারণ আমরা শীঘ্রই উল্লেখ করব।

আমরা সামনে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করব, যেগুলো আপনাকে পবিত্র ও সম্মানিত সাহাবিগণের ক্ষেত্রে ভুল মন্তব্য করা থেকে রক্ষা করবে।

—ড. রাগিব সারজানি

কায়রো, মিশর

গ্রন্থটি যেসব উদ্দেশ্যে লেখা

প্রথম উদ্দেশ্য : সাহাবিগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপবাদ ও আপত্তির জবাব দেওয়া

শুরুতেই আমাদের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কী কারণে ও কী উদ্দেশ্যে আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হবে, আমাদের প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রিয় সাহাবিগণের মর্যাদা রক্ষা করা। সাহাবিগণের মর্যাদা রক্ষা করা সত্তাগতভাবেই অত্যন্ত মর্যাদার বিষয়। কারণ, বর্তমানে সাহাবিগণের ওপর অনেক অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। ইসলাম বিকৃতকারী কুচক্রী মহল তাদের কাউকেই লক্ষ্যবস্তু বানাতে কুণ্ঠাবোধ করছে না; চাই অজ্ঞতাবশত হোক কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> যখন এ উম্মতের শেষাংশ প্রথমাংশের (সাহাবিগণের) ওপর (তাদের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত) অভিসম্পাত করবে, তখন যারা এ বিষয়ে (তাদের মর্যাদার বিষয়ে) জানে তারা যেন তাদের জ্ঞান প্রকাশ করে। নয়তো এই জ্ঞান গোপন করার কারণে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ জ্ঞানকে গোপন করার সমতুল্য অপরাধ হবে।[১]

আমরা চিন্তা করলে বুঝতে পারব যে, এ বাক্যটির গভীর মর্ম রয়েছে। সাহাবিগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির জবাব না দিলে মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ জ্ঞানকে গোপনকারী সাব্যস্ত হবে—এ কথার কী অর্থ?

আমাদের নিকট এই দ্বীন সাহাবিগণের মাধ্যমেই এসেছে। পবিত্র কুরআন রাসুল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি সাহাবিগণের নিকট তা বর্ণনা করেছেন। তারা কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন, যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন এবং আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। রাসুল ﷺ নিজ হাতে পবিত্র সুন্নাহ তথা হাদিস লিপিবদ্ধ করেননি। বরং তাঁর থেকে সাহাবিগণ তা বর্ণনা করেছেন। তাই কোনো সাহাবির ওপর অপবাদ আরোপ করা সুন্নাহকে

১. আল-মুজামুল আওসাত লিত তবারানি, ৪৩০

প্রশ্নবিদ্ধ করার সমতুল্য। বরং এতে কুরআনকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। কারণ, এই কুরআন রাসুল ﷺ থেকে সাহাবিগণের মাধ্যমেই প্রচার হয়েছে।

আমরা সকলেই জানি, শিয়ারা সাহাবিগণের ওপর কতশত অপবাদ আরোপ করেছে! হয়তো কখনো কেউ বিষয়টি সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করে বলতে পারে, যতক্ষণ তারা আল্লাহ তাআলার তাওহিদ এবং রাসুল ﷺ-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেবে, ততক্ষণ সাহাবিগণের ওপর অপবাদ আরোপ করার কারণে তাদের ঈমানে কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি খুবই ভয়াবহ এবং বিপজ্জনক।

আসুন দেখে নিই, সাহাবিগণের ওপর অপবাদ আরোপ করার পরিণাম কী দাঁড়ায়। তারা সাহাবিগণের বিভিন্ন দোষত্রুটি তুলে ধরেছে। একজন একজন করে সবাইকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। এমনকি তারা পাঁচজন সাহাবি ছাড়া অন্য সকল সাহাবিকে কাফের হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। এ মতবাদের প্রবক্তারা আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। যারা আমাদের কাছে শিয়া ইসনা আশারিয়া অথবা জাফরিয়া নামে পরিচিত। যে পাঁচজন সাহাবিকে তারা কাফের বলেনি তারা হলেন, আলি ইবনে আবু তালেব রা., মিকদাদ ইবনে আমর রা., আম্মার ইবনে ইয়াসির রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও সালমান ফারসি রা.।

তাদের কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে শিথিলতা করে ১১জন সাহাবি ছাড়া বাকি সকল সাহাবিকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং উমর রা.-এর মতো সাহাবিকে তারা জিবত (শয়তান) ও তাগুত (বাতিল আরাধ্য) বলে আখ্যা দিয়েছে। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা.-সহ অন্য সকল সাহাবির ওপর অসংখ্য অপবাদ আরোপ করেছে।

সাহাবিগণের ঘৃণ্য সমালোচনা এবং তাদের কাফের সাব্যস্ত করার ফলে তারা সাহাবিগণের মুখনিঃসৃত সব কথা বর্জন করেছে। ওই সকল সাহাবিগণ যত হাদিস বর্ণনা করেছেন সবগুলোকেই তারা পরিত্যাগ করেছে।

বিশুদ্ধ গণনা অনুযায়ী প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার সাহাবি যত হাদিস বর্ণনা করেছেন সবগুলোকেই তারা বাতিল আখ্যা দিয়েছে। এমনকি তাদেরকে আমানতের খেয়ানতকারী আখ্যা দিয়ে স্পর্ধার চূড়ান্তসীমা লঙ্ঘন করেছে। ফলে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করেছে। তাদের মূলনীতির ওপর ভিত্তি

করে ওই সকল সাহাবিগণ থেকে বর্ণিত হাদিসকে তারা বাতিল আখ্যা দিয়ে থাকে।

ইমাম বুখারি রহ. যেহেতু সে সকল সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন; তাই শিয়াদের কথা অনুযায়ী এগুলো সবই বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। আলি রা., সালমান ফারসি রা. প্রমুখগণ; যাদেরকে তারা কাফের সাব্যস্ত করেনি, *সহিহ বুখারিতে* তাদের বর্ণনা থেকে আনীত হাদিসগুলোও বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনইভাবে *সহিহ মুসলিম*, *সুনানুত তিরমিজি*, *আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, *সুনানু আবি দাউদ*-সহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ সংকলিত সকল সহিহ হাদিসগ্রন্থ তাদের দৃষ্টিতে বাতিল ও পরিত্যাজ্য।

এর চেয়েও ঘৃণ্য এবং বিপজ্জনক কথা হচ্ছে, তারা পবিত্র কুরআনুল কারিমকে বিকৃত সাব্যস্ত করার ঘৃণ্য অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। শিয়াদের নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ *কিতাবুল কাফি*। আমাদের নিকট সহিহ বুখারির যে মর্যাদা, তাদের নিকট এ গ্রন্থটির সেই মর্যাদা। এই গ্রন্থে জাফর আল-জুফির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে বলেছে,

আমি আবু জাফর[২] আ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দাবি করে যে, সে সম্পূর্ণ কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই সংকলন করেছে; সে মিথ্যাবাদী।[৩]

তাদের দাবি অনুযায়ী কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে সংকলিত হয়নি। একমাত্র আলি রা. এবং তার পরবর্তী ইমামগণই কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন।[৪] তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, কুরআনের ১৭ হাজার আয়াত রয়েছে।[৫] অথচ আমরা জানি কুরআনের মোট আয়াত ৬২৩৬টি। আরও বলে, আমাদের কাছে যে কুরআন আছে, মূল কুরআন এর চেয়ে তিনগুণ বড়।[৬] আরও বলে, তাদের অদৃশ্য ইমাম, যিনি কোনো একদিন এসে আত্মপ্রকাশ করবেন; কুরআন তার

---

২. আবু জাফর সাদিক রহ. শিয়াদের থেকে মুক্ত। শিয়ারা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যত কথা বলেছে তা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি ছিলেন আলি রা.-এর বংশধর। শিয়ারা তাকে তাদের ষষ্ঠ ইমাম হিসাবে আখ্যা দিয়ে থাকে।

৩. *কিতাবুল কাফি*, ১/১৩৫

৪. *কিতাবুল কাফি*, ১/১৩৬

৫. *কিতাবুল কাফি*, ২/৩৫০

৬. *কিতাবুল কাফি*, ১/১৪১, *আশ-শিয়া ওয়াল কুরআন*, ৪২

সঙ্গে গোপন রয়েছে। আমাদের মাঝে যে কুরআন রয়েছে, তাতে অনেক বিকৃতি এবং ভ্রষ্টতা রয়েছে (নাউজুবিল্লাহ)। তবে বর্তমানে তাদের তাকিয়্যা নামক বিশ্বাস অনুযায়ী তারা এ কুরআনকে স্বীকার করে থাকে।

তাকিয়্যার শাব্দিক অর্থ আত্মরক্ষা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে, নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য আপনি মনেপ্রাণে যা বিশ্বাস করেন তার বিপরীত প্রকাশ করা এবং আপনার অন্তরে নেই এমন কথা বলা।

শিয়াদের নিকট তাকিয়্যার আকিদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তারা বলে থাকে, 'যে তাকিয়্যায় বিশ্বাস করে না, তার দ্বীন নেই।' তাদের কথা অনুযায়ী তাকিয়্যা হচ্ছে দ্বীনের ১০ ভাগের নয়ভাগ। তাই দেখা যায়, তারা আমাদের মাঝে যে কুরআন রয়েছে, বাহ্যত তার প্রতি ঈমানের কথা স্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের বইপত্রে তাদের বক্তব্য হচ্ছে—

প্রকৃত কুরআন সেটিই, যাতে ১৭ হাজার আয়াত রয়েছে। যা রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ফাতেমা রা.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি এ কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। এরপর আলি রা.-ও পরবর্তী ইমামগণ তার কাছ থেকে আয়ত্ব করেছেন।' তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ আয়াত রহিত হয়ে গেছে।[৭] যেমন, সুরা ইনশিরাহের প্রথম আয়াত,

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾

আমি কি আপনার বক্ষকে উন্মোচিত করিনি?

তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এ আয়াত রহিত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে সেখানে হবে,

«وجعلنا عليا صهرك»

আমি আলিকে বানিয়েছি আপনার মেয়ের জামাই।

এ আলোচনা তাদের গ্রন্থ *কিতাবুল কাফি*-তে রয়েছে। বর্তমান ইরানি কুরআনের সুরা বেলায়া-এর মধ্যে এটি রয়েছে! আমাদের কুরআনে এ

৭. *কিতাবুল কাফি*, ১/১৪২

আলোচনা নেই এবং না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাদের গ্রন্থে এই সুরাটি এভাবে আছে,

«يا أيها الذين امنوا امنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما لهدايتكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم. والذين إذا تليت عليهم اياتنا كانوا بايتنا مكذبين؛ إن لهم في جهنم مقاما عظيما. إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين. ما خلفهم المرسلين بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين»

হে ঈমানদাররা, তোমরা ঈমান আনো নবী এবং অলির প্রতি। যাদের আমি প্রেরণ করেছি, তোমাদের সরলপথ দেখানোর জন্য। আমার নবী এবং অলি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। আমিই সর্বজ্ঞ এবং সর্বাধিক অবগত। নিশ্চয় যারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। আর যাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ স্থান নির্ধারিত। কেয়ামতের দিন তাদের এই বলে ডাকা হবে যে, ওই সকল মিথ্যাবাদী জালেমরা কোথায়, যারা আমার প্রেরিত দূতদ্বয়কে অস্বীকার করেছে? তাদের পরবর্তী সময়ে সত্য নিয়ে আর কোনো দূত প্রেরিত হবে না। আল্লাহ নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তাদের প্রকাশ ঘটাবেন না। আর তোমাদের প্রভুর তাসবিহ পাঠ করো এবং জেনে রাখো, আলি সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত।

এসব আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, সাহাবিগণের মর্যাদা রক্ষা করা সম্পূর্ণ দ্বীন রক্ষার নামান্তর। যদি ওই সকল ভ্রান্ত দাবিদারকে সুযোগ করে দেওয়া হয়, তবে অচিরেই সুন্নাহের বিলুপ্তি ঘটবে। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, সেই দ্বীন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনটি বাস্তবেই ঘটেছিল, যখন ওই সকল বিকৃতকারী কোনো কোনো অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। যেমন, মিশরে শিয়া ফাতেমিদের শাসনকালে তারা সুন্নাহকে সম্পূর্ণভাবে রহিত করে দিয়েছিল। তারা এমন সব বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা কুফর থেকে মুক্ত নয়। ফাতেমিদের ইতিহাস অধ্যয়নকারীগণ এমন অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : ইতিহাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করা

পৃথিবীতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এটি আল্লাহ তাআলার অবধারিত রীতি। তিনি বলেন,

﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا﴾

আল্লাহ তাআলার স্থিরীকৃত নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না। এবং আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মকে কখনো টলতেও দেখবে না।

[সুরা ফাতির : ৪৩]

সাহাবিগণের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলি, তার কারণ, প্রকৃতি এবং ফলাফল এমন বিষয়, যুগে যুগে যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আমাদের যুগে আসবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বারবার পুনরাবৃত্তি হবে। তাই প্রথমে আমাদের জানতে হবে, তাদের মধ্যকার বিরোধের প্রধান কারণ কী ছিল? কীভাবে সেগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল? এর ফলাফল কী হয়েছিল? এবং কীভাবে এর ইতি ঘটেছিল?

যেন আমরা আল্লাহ তাআলার এই আদেশ থেকে উপকৃত হতে পারি। তিনি বলেন,

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আপনি ঘটনা বর্ণনা করুন, যেন তারা চিন্তাভাবনা করতে পারে।

[সুরা আরাফ : ১৭৬]

তিনি আরও বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

নিশ্চয় তাদের ঘটনাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষার উপাদান রয়েছে। এটি কোনো মনগড়া কথা নয় বরং তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং ঈমান আনয়নকারীদের জন্য হেদায়েত ও রহমতের উপকরণ। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

তৃতীয় উদ্দেশ্য : বিকৃত আকিদাসমূহের সংশোধন

এসব ঘটনা সম্পর্কে যখন আমরা জানব, ভ্রান্ত দলগুলোর আত্মপ্রকাশের ইতিহাস সম্পর্কে অবগতি লাভ করব এবং তারা যে বিকৃত আকিদাগুলোর অনুসরণ করে, কীভাবে সেগুলো তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে; এ নিয়ে অধ্যয়ন করব, তখন আমাদের সামনে তাদের আকিদা আরও স্পষ্ট হবে এবং এসব আকিদার ব্যাপারে সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গিও উদ্ভাসিত হবে।

যখন আমাদের অন্তরে এ সব উদ্দেশ্যের সম্মিলন ঘটবে ও আমাদের অধ্যয়ন হবে এসব মহান উদ্দেশ্যে, শুধু ঘটনা এবং কেচ্ছা শোনার উদ্দেশ্য নয়, তখনই আমরা বিপদ থেকে নিরাপদ হতে পারব। এ বিষয়ে মনগড়া ঘটনা অনেক রয়েছে। তবে কিছু মানুষ এগুলো অধ্যয়ন বা শ্রবণ করে পুলক বোধ করে। অথচ এটি খুবই মারাত্মক একটি ব্যাপার। হাসান বসরি রহ.-কে সাহাবিগণের মধ্যে সংঘটিত ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের তরবারিগুলো তাদের রক্ত থেকে নিরাপদ রেখেছেন। তাই আমরাও আমাদের কলমকে তাদের সম্মানে আঘাত করা থেকে নিরাপদ রাখতে চাই।

এই অধ্যায় (উসমান ইবনে আফফান রা.-এর হত্যাকাণ্ডের আলোচনা) শুরু করার আগে বলে রাখা আবশ্যক যে, মানুষ এই ফিতনা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে যেসব তথ্য জানে তার বেশিরভাগই বিকৃত। স্কুল, মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা যে ইতিহাস পড়েছি, সেগুলোও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করা হয়েছে। অচিরেই এ বিষয়ে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

এ বিষয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ফিতনা নিয়ে গবেষণা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সম্পর্কে জানতে পারব। এই মূলনীতিটি আমাদের সামনে এমন একটি শাস্ত্রের পরিচয় তুলে ধরবে, যে শাস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এই শাস্ত্র হচ্ছে ইলমুর রিজাল বা ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল।

শুরুতে আমাদের বলে রাখা উচিত, রাসুল ﷺ থেকে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হচ্ছে মতন তথা হাদিসের মূল বক্তব্য। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে সনদ তথা বর্ণনাসূত্র। ইলমুর রিজালে বা

ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিলে সনদের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আলেমগণের নিকট জারহ-এর সংজ্ঞা হচ্ছে, কোনো বিজ্ঞ হাফিজুল হাদিস[৮] কোনো বর্ণনায় কিংবা বর্ণনাকারীর মধ্যে ফিসক[৯], তাদলিস[১০], মিথ্যা, শুযুয[১১] অথবা এ ধরনের অন্য কোনো ত্রুটি থাকায় বর্ণনাটি গ্রহণ না করা। যেমন, কোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে তিনি বললেন, এই বর্ণনাকারীর মধ্যে সমস্যা রয়েছে। সে মিথ্যাবাদী বা হাদিস জালকারী, অথবা সে নির্ভরযোগ্য নয় কিংবা সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলে যায়। আর এ কারণে ওই বর্ণনাকারীর বর্ণিত বর্ণনাকে তিনি গ্রহণ করলেন না।

তাদিলের সংজ্ঞা হচ্ছে, একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তার মধ্যে যেসব গুণ থাকা উচিত তাকে সেসব গুণে গুণান্বিত সাব্যস্ত করা।

সনদের বা বর্ণনাসূত্রের মান বিচারের মধ্য দিয়েই আমরা হাদিস সহিহ[১২], জয়িফ[১৩] বা জাল[১৪] কি না তা জানতে পারব।

ইলমুর রিজাল বা ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্রের মর্যাদা রাখে। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ.; যিনি ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর সামসময়িক ব্যক্তিত্ব—তার মতো অনেক বিজ্ঞ আলেম এ শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

---

৮. **হাফিজুল হাদিস :** হাফিজুল হাদিস বলতে বিপুলসংখ্যক হাদিস আত্মস্থকারী ও হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়। *আন-নুকাতুস সামিনা ফি মুক্তাহিল সুন্নাহ লিশ শায়খ আবদিল মাতিন*।-সম্পাদক

৯. **ফিসক :** কবিরা গুনাহ পর্যায়ের পাপাচারে লিপ্ত হওয়া।-সম্পাদক

১০. **তাদলিস :** হাদিসশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। এর উদ্দেশ্য হলো বর্ণনার ত্রুটি ঢেকে রাখা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বর্ণনায় ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া। হাদিসশাস্ত্রে এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।-সম্পাদক

১১. **শুযুয :** হাদিসশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার সমপর্যায়ের বর্ণনাকারীদের অথবা উচ্চপর্যায়ের বর্ণনাকারীদের বিপরীত বা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করাকে বুঝানো হয়। অনুরূপভাবে অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত বা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করাকেও বুঝানো হয়। শরহু নুখবাতিল মুহাদ্দিস, পৃ. ৪১৫-৪২৫।-সম্পাদক

১২. **সহিহ :** বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হাদিস।-সম্পাদক

১৩. **জয়িফ :** অনির্ভরযোগ্য হাদিসের একটি প্রকার, এ প্রকারের হাদিস দ্বারা শরিয়তের কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় না। *আল-আজবিবাতুল ফাযিলা*।-সম্পাদক

১৪. **জাল :** এমন হাদিসকে বলা হয় যা নবীজি ﷺ-এর নামে চালানো হয়, কিন্তু বাস্তবে নবীজি তা বলেছেন বা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, লামাহাত মিন তারিখিস সুন্নাহ ওয়া উলুমিল হাদিস।-সম্পাদক

তবে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, ফিতনা সম্পর্কিত যত হাদিস এবং বর্ণনা রয়েছে, এর মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি অত্যন্ত দুর্বল এবং রাসুল ﷺ ও সাহাবিগণের নামে জালকৃত।

এ কথা বলাও গুরুত্বের দাবি রাখে যে, রাসুল ﷺ-এর হাদিসসমূহের সংকলন শুরু হয়েছিল উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর খেলাফতকালে। অর্থাৎ রাসুল ﷺ-এর হিজরতের প্রায় ১০০ বছর পর। যখন উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. দেখতে পেলেন যে, মানুষ রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ ভুলে যাচ্ছে এবং উম্মাহর এই অমূল্য সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তখন তিনি সেই সময়কার বিজ্ঞ আলেম ইমাম যুহরি রহ.-কে হাদিস সংকলনের আদেশ দেন। তিনি এসব হাদিস লিপিবদ্ধকরণ এবং সংকলনের দিকে মনোযোগী হন। সে সময় সাহাবিগণের মধ্যে কেবল হাতে গোনা কজন সাহাবি জীবিত ছিলেন। আর আমরা জানি যে, সর্বশেষ সাহাবির ইন্তেকাল হয়েছিল ১১০ হিজরিতে। তাই ইমাম যুহরি রহ. সম্পূর্ণরূপে ইলমুর রিজালের ওপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে গবেষণা করে হাদিস সংকলন করতে থাকেন। তার পরবর্তী সময়ে আসেন ইমাম বুখারি রহ. এবং ইমাম মুসলিম রহ. প্রমুখ মনীষীগণ। তারা এসে 'অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন' এই সূত্র ধরে হাদিস লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। তখন ইলমুর রিজাল এবং ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিলের গুরুত্ব প্রকাশ পেতে থাকে।

৬০০ হিজরিতে এসে একজন লোক যখন কোনো একটি হাদিস পাঠ করে, তখন এই মন্তব্য করতে পারে যে, এই হাদিসটি দুর্বল। কারণ, এই হাদিসে অমুক বর্ণনাকারী রয়েছে, যাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর হাদিস সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করা অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বিষয়। এই পদ্ধতিতে নিশ্চিতভাবে হাদিসের মান নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আলেমগণ একজন বর্ণনাকারীর সম্পূর্ণ জীবনী অধ্যয়ন করতেন। তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেছেন, কখন তার মৃত্যু হয়েছে, কোথায় বাস করেছেন, কোন কোন শহরে কত সময় থেকেছেন, তার সম্পর্কে মানুষের কী মন্তব্য ছিল, তিনি কি সত্যবাদী ছিলেন নাকি মিথ্যাবাদী, আমানতদার ছিলেন নাকি খেয়ানতকারী—এসব নিয়ে তারা বিস্তারিত পড়াশোনা করেছেন।

এই শাস্ত্রই আমাদের জন্য সুন্নাহকে সংরক্ষণ করেছে। সংরক্ষণ করেছে সাহাবিগণের কার্যাবলি। এমনইভাবে আমাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে

ফিতনাসংক্রান্ত হাদিসসমূহ। বিশেষভাবে আমাদেরকে জানিয়েছে যে, এ বিষয়ে রয়েছে অনেক মনগড়া হাদিস।

আমরা যদি শিয়াদের বর্তমান গ্রন্থাদির দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাব তাদের কাছে ইলমুল জারহ ওয়াত তাদিল নামক অতি প্রয়োজনীয় এই শাস্ত্রের কোনো চিহ্নও নেই। একমাত্র আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কাছেই এ শাস্ত্রের মূল্যায়ন রয়েছে। তাই আমরা দেখি, শিয়ারা অমুক থেকে অমুক, এভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে একপর্যায়ে নির্দিষ্ট কারও নাম উল্লেখ না করে এভাবে বলতে থাকে যে, সে বর্ণনা করেছে তার চাচার সূত্রে, সে তার পিতার সূত্রে, সে একদল মানুষ থেকে। এখন এই অস্পষ্ট কথাগুলো দ্বারা কাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাদের বিবরণে তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোনো হাদিস বিশারদ এ বর্ণনাকারীদেরকে চেনে না, ফলে এদের কারও সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মন্তব্য করতে পারছে না। এভাবেই নানা অস্পষ্টতা রয়ে যায়। এ ছাড়া তাদের অনেক বর্ণনাকারীর ব্যাপারেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ একমত যে, হাদিসশাস্ত্রে তাদের বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

রাসুল ﷺ এবং সাহাবিগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মনগড়া হাদিস রচনার প্রসার ঘটেছিল আব্বাসি খেলাফতকালে। কারণ, সে সময় ওই সকল পথভ্রষ্টরা ছিল খুবই শক্তিশালী। আব্বাসি খলিফাগণ তাদের প্রতিরোধে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই ঘৃণ্য অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে অনেক সতর্কবার্তাও দিয়েছেন। তবুও তারা এই অপকর্ম অব্যাহত রেখেছে।

***